জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা '৯৯

সবার জন্য বন

বন অধিদপ্তর
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনায় : এডোবী কমিউনিকেশন লিঃ

বাণী

দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযানকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষে আমি সবাইকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে বলি, 'বৃক্ষ মানুষের অন্তরঙ্গ বন্ধু'।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জ্বালানী ও অন্যান্য চাহিদা পূরণের জন্য বনজ সম্পদের উপর চাপ বাড়ছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণেও বনজ সম্পদের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। ভারসাম্য ও দূষণমুক্ত পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিকল্পিত বনায়ন সৃষ্টি অত্যন্ত জরুরী। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বনজ সম্পদ বৃদ্ধি করা হলে তা জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ সংগ্রহ এবং দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হবে।

চারপাশের পরিবেশকে সুন্দর ও জীবনের অনুকূল করে গড়ে তোলার জন্য আমি বৃক্ষরোপণ অভিযানের সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বনায়নে সামাজিক রূপদান : বন বিভাগের ভূমিকা

মোঃ গোলাম হাবিব, প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের বন, বনভূমি ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণে বন বিভাগের ভূমিকা ও অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুদীর্ঘ ১৩০ বছর যাবৎ বন বিভাগ নিষ্ঠার সাথে বন ব্যবস্থাপনা করে আসছে। [illegible]

[illegible] করে। বনজ চারা বড় না হওয়া পর্যন্ত কৃষি ফসলের আবাদ চলতে থাকে। এতে প্রাপ্ত কৃষি ফসলের সবটুকুই ভোগ করে বনায়নের সাথে সম্পৃক্ত জনগণ। টাঙ্গিয়া পদ্ধতির পাশাপাশি বনায়ন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্য বন বিভাগ ফরেষ্ট ভিলেজারস্ পদ্ধতি অবলম্বন করে। এ পদ্ধতিতে বনায়ন কাজ করার আগ্রহী লোকজনকে বন এলাকায় বসবাসের জন্য গ্রামের সৃষ্টি করা হয়। ফরেষ্ট ভিলেজারগণ দৈনিক মুজুরীর ভিত্তিতে বনায়ন কাজে অংশগ্রহণ করে এবং বনজ চারার ফাঁকে ফাঁকে কৃষি ফসল চাষ করে এবং উৎপাদিত ফসলের সম্পূর্ণটি ভোগ করে।

বস্তুত জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বর্তমানে যে কৃষি বনায়ন (Agroforestry) করা হচ্ছে তা মূলত শতবর্ষের টাঙ্গিয়া পদ্ধতিরই আধুনিক রূপ। আগে এ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী জনগণ উৎপাদিত কাঠের ভাগ পেত না শুধু কৃষি ফসল ভোগ করতে পারত আর বর্তমানে কৃষি বনায়ন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী জনগণ কৃষি ফসল ভোগের পাশাপাশি বাগানে উৎপাদিত বনজদ্রব্যের একটা অংশ পায়।

জনগণকে বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বন বিভাগ ১৯৬০ সন হতে বাংলাদেশে সর্ব প্রথম বন সম্প্রসারণ কর্মসূচী গ্রহণ করে। ফরেষ্ট এক্সটেনশন সার্ভিস স্কীম (১৯৬০-৬৫) এর আওতায় তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ১০ টি জেলা সদরে নার্সারী স্থাপন করে জনগণের মাঝে বিনা মূল্যে চারা বিতরণ করে এবং জনসাধারণকে বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা বিষয়াদি হাতে কলমে প্রদর্শন করে। বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ বিষয়াদি লিফলেট ও পুস্তক আকারে প্রকাশ করে জনগণের মাঝে বিতরণ করে। উক্ত ১০টি নার্সারী কার্যক্রম দেখা শুনার জন্য রাজশাহীতে বন সম্প্রসারণ বন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

অতঃপর ফরেষ্ট এক্সটেনশন সার্ভিস বর্ধিত স্কীম (১৯৬১-৬৫) এর আওতায় তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে (চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা বাদে) ১৫টি জেলায় ৫৯ টি মহকুমায় গ্রামীন জনগণের নিকট চারা বিতরণের নিমিত্তে নার্সারী স্থাপন করা হয়। ১৯৬৪ সনে ঢাকায় ১টি বন সম্প্রসারণ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৬০-৬৫ সন পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ৩০ লক্ষ চারা জনগণের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এতে জনসাধারণের মধ্যে বৃক্ষরোপণের আগ্রহ বেড়ে যায়।

অপরদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পারিবারিক ও শিল্পে কাঠের চাহিদা বেড়ে যায়। তাই গ্রামীন জনপদে বৃক্ষ সম্পদ বাড়ানোর তাগিদে বন বিভাগ ফরেষ্ট এক্সটেনশন সার্ভিস স্কীম (১৯৬৬-৭০) নামে আরেকটি বন সম্প্রসারণ কর্মসূচী গ্রহণ করে। উক্ত প্রকল্পের অধীনে বিনামূল্যে চারা বিতরণের পরিবর্তে ১ টাকায় ১০০টি চারা বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়। উক্ত সময়ে বন সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য বন সম্প্রসারণ বিভাগ দক্ষিণ, ঢাকা এর অধিক্ষেত্রে নির্ধারণ করা হয় ৫টি জেলা যথা বৃহত্তর ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, কুমিল্লা ও নোয়াখালী এবং বন সম্প্রসারণ বিভাগ উত্তর, রাজশাহীর অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয় ৭টি জেলা যথা বৃহত্তর রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, রংপুর ও দিনাজপুর।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান গ্রামীণ জনপদে বৃক্ষ সম্পদ বৃদ্ধি ও পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন চিত্তবিনোদন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উপর জোর দেন। বঙ্গ বন্ধুর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও নির্দেশে ঢাকার সরোওয়ার্দী [illegible]

[illegible] প্রথম কৃষক, গ্রাম্য নেতা, ইমাম, স্কুলের শিক্ষক, বেকার যুবক, মহিলা, এনজিও কর্মী প্রভৃতিকে সামাজিক বনায়নের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

[illegible] পরিবার কাঠ, জ্বালানী কাঠ ও কৃষি ফসল সর্বমোট ৪২,১৮৪/- টাকা আয় করে।

কমিউনিটি ফরেষ্ট্রি প্রকল্প সফল বাস্তবায়নের পর এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থানুকুল্যে সমগ্র দেশ ব্যাপী (বান্দরবন, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলা বাদে) জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে থানা বনায়ন ও নার্সারী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় জনগণের অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে সরকারী বনে উডলট বাগান- ১৯,৫৬২ হেক্টর, কৃষিবনায়ন ৫১৮০ হেক্টর, পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধের বাহিরে বনায়ন ১,১৮০ হেক্টর, ষ্ট্রীপ বাগান (সওজ, সংযোগ সড়ক, রেলপথ ও বাঁধের ধারে) সৃজন-১৮১০৮ কি.মি.। প্রতিষ্ঠান বনায়নে ৮১.৪৬ লক্ষ চারা, জনসাধারণের নিকট বিতরণের জন্য ১,০৬৬ লক্ষ চারা উত্তোলন, ৩৪৫ টি থানা নার্সারী ও সামাজিক বনায়নে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ৯০,৯০০ জনকে।

অতঃপর সমগ্র দেশ ব্যাপী সম্প্রসারিত সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের (১৯৯৬-৯৭) এর আওতায় জনগণের অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে উডলট বাগান ৫৮২ হেক্টর, কৃষি বনায়ন ৯৬৭ হেক্টর, সওজ, রেলপথ ও বাঁধ বাগান ১৩৯১ কি.মি. সংযোগ সড়ক বাগান, ২২৬৭ কি.মি. সৃজন করা হয়। তা ছাড়া প্রতিষ্ঠান বনায়নের জন্য ২২.০ লক্ষ চারা জনসাধারণের নিকট বিক্রয়/বিতরণের জন্য ৮৭.০ লক্ষ চারা উত্তোলন করা হয়। বাংলাদেশের দাক্ষিণাঞ্চলের ১৪টি জেলা নিয়ে উপকূলীয় অঞ্চল ঘটিত প্রায় প্রতি ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণের ব্যাপক জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসের প্রলয়ংকারী ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে প্রায় ১,৪০,০০০ লোক মারা যায় এবং অবকাঠামো, ঘরবাড়ী ও অন্যান্য সম্পদের বিপুল ক্ষতি হয়। লক্ষ্য করা গেছে যেখানে বৃক্ষের আচ্ছাদন ছিল সেখানে ঝড় ও জলোচ্ছাসে তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। ১৯৯১ সনের ঘুর্ণিঝড়ের পর বাংলাদেশ সরকার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও নোরাডের আর্থিক সহায়তায় উপকূলীয় এলাকায় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প (১৯৯৫-০২) ৭ বছর মেয়াদী একটি বনায়ন প্রকল্প গ্রহণ করে। অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে বাঁধ, সড়ক বাগান ও সংযোগ সড়ক বাগান করা হচ্ছে। জনগণের কাঠের পাশাপাশি ফলের চাহিদা মেটানোর জন্য বাগানে তাল, খেজুর কাঁঠাল, পেয়ারা, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি ফলজ গাছ লাগানো হচ্ছে। ১৯৯৭-৯৮ সন পর্যন্ত বাঁধ বাগান ৬৮০ কি.মি. সওজ বাগান ৪১৪ কি.মি., সংযোগ সড়ক বাগান ২১৫৮ কি.মি., পরীক্ষামূলক ফোরসোর বাগান ১২৯.৫ হেক্টর সৃজন করা হয়েছে। বসতবাড়ী বনায়নের জন্য ৮৫.৭৮ লক্ষ, প্রতিষ্ঠান বনায়নের জন্য ৩৯.৮ লক্ষ চারা বিনামুল্যে বিতরণ করা হয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছর বাঁধ বাগান ২১০ কি.মি., সওজ বাগান ১১৭ কি.মি. সংযোগ সড়ক বাগান ১০৭৩ কি.মি. ফোরসের বাগান ১৫০ হেক্টর সৃজন করা হবে। উত্তোলিত খরচে চারা বিক্রয়ের জন্য ৭৭.৪৩ লক্ষ চারা উত্তোলন করা হচ্ছে। ১৬০৭৬ জন উপকারভোগী কৃষক, গ্রাম্য নেতা ও ৬৭৮ জন বন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কে সামাজিক বনায়নের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ সালে ৪১৯১ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়ার কর্মসূচী রয়েছে।

জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সারাদেশ ব্যাপী বনজ সম্পদকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষসহ বিদ্যমান বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সরকার ফরেষ্ট্রি সেক্টর প্রকল্প (১৯৯৭-০৪) [illegible]

অনুরূপভাবে রাজশাহী বন সম্প্রসারণ বিভাগের আওতায় সৃজিত ৪৩ কি.মি. ও পাবনা বন সম্প্রসারণ বিভাগের ১৭ কি.মি. কর্তিত ষ্ট্রীপ বাগান থেকে গড়ে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫১২ টাকা আয় হয়। এর মধ্যে ৮৮ হাজার টাকা উপকারভোগীরা পেয়েছে।

বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণকে আরও জোরদার, গণমূখী এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ অভিযান উপলক্ষ্যে দেশের রাজধানী হতে শুরু করে জেলা ও থানা পর্যায়ে বৃক্ষর‌্যালী আয়োজন করা হয়। এ সব র‌্যালীতে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, আনসার, ভিডিপি, স্কাউটসহ সর্ব স্তরের জনসাধারণ যোগদান করে থাকে।

দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বন বিভাগ স্কুল কলেজ, মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রীদের বিনা মুল্যে চারা বিতরণ করে থাকে। এর ফলে কোমলমতি ছাত্র ছাত্রীদের মনে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জাগত করার ফলে বৃক্ষরোপণ আন্দোলনে বেশ সুফল পাওয়া গেছে।

গ্রাম পর্যায়ে বন বিভাগের সামাজিক বনায়ন ও নার্সারী উত্তোলন ও বাগান সৃজন সম্পর্কে ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে বর্তমানে দেশে ৫ হাজারের অধিক বেসরকারী নার্সারী স্থাপিত হয়েছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে এসব নার্সারী হতে প্রতিবছর প্রায় ১২ কোটি ৫০ লক্ষ চারা বিক্রয় হচ্ছে।

বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমকে জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেয়া, সচেতনতা বৃদ্ধি, বনাঞ্চল ও বনভূমি সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বন বিভাগ সেমিনার ওয়ার্কসপ আয়োজন করছে। বেতার ও টেলিভিশনে প্রচার করছে। পোষ্টার, লিফলেট, ফোল্ডার, পুস্তক প্রকাশ করে বিতরণ করছে।

বন বিভাগের গণমূখী ও বন সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের ফলে আজ বনায়ন একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। দেশের সর্বস্তরের জনগণ বৃক্ষের উপকারিতা, সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে। এ পর্যন্ত সামাজিক বনায়ন কর্মকাণ্ডে ৬৮৭২৪০ জন ভূমিহীন দরিদ্র গোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে ৩১৭২৫২ জন মহিলা। বনায়নে জনগণের অংশগ্রহণের ফলে বাংলাদেশের বিশেষ করে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জেলা সমুহের বন শূন্য এলাকা এখন সবুজে সবুজে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সামাজিক বনায়ন কর্মকাণ্ডের ফলে আজ পর্যন্ত প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার বনজ সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া ২০ কোটি ৯০ লক্ষ কর্মদিবস সুযোগ সৃষ্টির হওয়ায় কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জনগণ অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হয়েছে। দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু বনজ সদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শুধুমাত্র সরকারী উদ্যোগই যথেষ্ট নয়। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ, বন, বনভূমি ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নই হল বন বিভাগের প্রধান লক্ষ। আশা করি সর্বস্তরের জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে সামাজিক বনায়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে লাভবান হবেন এবং দেশের আর্থসামাজিক ও পরিবেশ উন্নয়নে অবদান রাখবেন।

বন সংরক্ষণ ও বনায়ন কার্যক্রমে সহানভূতিশীল হলে বন বিভাগের ব্যাপক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও এতদবিষয়ে অবদান রাখা সহজতর। তবে [illegible]

বাণী

পরিবেশ সংরক্ষণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে বৃক্ষের ভূমিকা অপরিসীম। মূল্যবান বৃক্ষ সম্পদ কমে যাওয়ায় আমরা প্রতিনিয়ত ক্ষুধা, দারিদ্র ও পুষ্টিহীনতার শিকার হচ্ছি। অন্যদিকে পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার কারণে আমরা ঝড়, জলোচ্ছাস, খরা, বন্যা, মরুময়তা, ভূমি ক্ষয় ও বায়ু দুষণের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে পড়ছি। এক সময় বাংলাদেশ ছিল বৃক্ষ সম্পদে আর সবুজের সমারোহে সমৃদ্ধ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত বৃক্ষ আহরণ ও জন-সচেতনতার অভাবে এ সম্পদ ও সৌন্দর্য ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে বৃক্ষ সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে সমৃদ্ধ দেশ গঠনের লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়ন অন্যতম। আমাদের বিশ্বাস সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ বৃক্ষ রোপণে অংশ নিয়ে বৃক্ষ সম্পদ বৃদ্ধিতে অবদান রাখবেন।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশ যেমন ভরে উঠবে সবুজের সমারোহে তেমনি পরিবেশে আসবে ভারসাম্য, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে আসবে গতিশীলতা। আমরা জয় করতে পারবো ক্ষুধা ও দারিদ্রকে, আপন শক্তিতে ও সামর্থে বলিয়ান হয়ে প্রতিরোধ করতে পারবো রোগ ব্যাধিকে, রুখে দাড়াতে পারবো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বর্ষা মৌসুমে ১৫ জুন হতে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনমাস ব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান ১৯৯৯ পালিত হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ জুন জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলার উদ্বোধন করবেন। আমি আশা করি বৃক্ষরোপণ অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে বনজ, ফলজ, ভেষজ, শিল্প ও কুটির শিল্পের উপযোগী গাছগাছালি রোপণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে বড় করে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পারিবারিক আয়ের পথ প্রশস্ত করবেন।

বৃক্ষরোপণ আন্দোলনকে আরও বেশি গণমুখী করার জন্য বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃক্ষমেলার আয়োজন করেছে। এর ফলে স্থানীয় জনগণ বনায়ণে নতুন নতুন প্রযুক্তি, জ্ঞান, কলাকৌশল সম্বন্ধে অবগত হতে পারবেন যাহা বৃক্ষ সম্পদ বৃদ্ধিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। তা ছাড়া জনগণ মেলা থেকে পছন্দসই বনজ, ফলজ, ভেষজ, উদ্ভিদ সংগ্রহ করতে পারবেন। এতে করে প্রযুক্তি ও জ্ঞানের আদান প্রদান ঘটবে যা বৃক্ষ সম্পদ বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

বৃক্ষরোপণে অনন্য কৃতিত্বের জন্য যারা ১৯৯৮ সালের " বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার" পেয়েছেন আমি তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সরকারের এ উদ্যোগে জনগণ অনুপ্রাণিত হয়ে আরও বেশি বৃক্ষরোপণে আগ্রহী হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

আমি জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা '৯৯ এবং বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার '৯৮ প্রদান অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী
মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বৃক্ষ অন্যতম প্রধান উপাদান। বৃক্ষ দেশ থেকে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ দূর করে। সারাদেশে ১৫ই জুন হতে ৩ মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বৃক্ষরোপণ অভিযানের অংশ হিসেবে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃক্ষমেলা আয়োজিত হচ্ছে। আশা করি জনসাধারণ মেলা থেকে প্রয়োজনীয়, দুর্লভ ও আকর্ষণীয় বৃক্ষের চারা সংগ্রহের সুযোগ পাবেন; বনায়ন, বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্বন্ধে নতুন ধারণা পাবেন এবং এর মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার জ্ঞানের আদান প্রদানে নতুন দিগন্তের সূচনা হবে। আসুন আমরা প্রত্যেকে অন্তত একটি বনজ ও একটি ফলজ গাছ লাগিয়ে দূষণমুক্ত পরিবেশ সংরক্ষণে শরীক হই এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখি।

যে সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার '৯৮ এ ভূষিত হয়েছেন আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। আশা করি সরকারের এ উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বস্তরের জনসাধারণ অধিক হারে বৃক্ষরোপণে উৎসাহী হবেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ, বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধ, নির্মল, দূষণমুক্ত ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।

আমি শতাব্দীর শেষ জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা '৯৯এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৫ই জুন হতে সারাদেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান, ১৯৯৯ শুরু হচ্ছে এবং তা আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। বৃক্ষরোপণ অভিযানে শরীক হওয়ার জন্য আমি সবাইকে আহবান জানাই।

বৃক্ষ আমাদের জীবনের সাথে যেমন অংগাংগীভাবে জড়িত তেমনি পরিবেশ প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় উদ্ভিদরাজির কোন বিকল্প নেই। সুস্থ ও সুন্দরভাবে বাঁচতে হলে পৃথিবীতে বৃক্ষের উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে বৃক্ষের ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশ পৃথিবীর জনবহুল দেশের অন্যতম। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে আমাদের বনজসম্পদ ও বনভূমি কমে আসছে। আমাদের যে বনাঞ্চল রয়েছে সেগুলো দেশের সর্বত্র সমানভাবে বিস্তৃত নয়। অধিকাংশ বনাঞ্চল দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। তাই বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র সুষম ভাবে গ্রামীণ জনপদে বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ করে সবুজ আচ্ছাদন তৈরী করতে হবে। সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীকে ত্বরান্বিত করার জন্য সকল সরকারী, আধা-সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য আহবান জানাই।

বন্যপ্রাণী প্রকৃতি ও পরিবেশের একটি অংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পাহাড়ী ও গ্রামীণ বনাঞ্চল কমে আসায় বন্যপ্রাণীর খাদ্য ও আবাসস্থলের দারুন সংকট দেখা দিয়েছে। তাই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য বৃক্ষরোপণের আহবান জানাই। কুটির শিল্প ও ঔষধ শিল্পের উপযোগী গাছগাছালি কমে যাচ্ছে। তাই এ সব শিল্পের উপযোগী বাঁশ, বেত, মূর্তা ভেষজ উদ্ভিদ চাষের জন্যও আহবান জানাচ্ছি।

বৃক্ষরোপণে জনগনকে আরও বেশী আকৃষ্ট করার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও ঢাকায় জাতীয় বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হচ্ছে। বৃক্ষমেলা হল বনায়ন ও বৃক্ষায়নের আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের একটি উপযুক্ত মাধ্যম এবং প্রয়োজনীয় চারা সংগ্রহের একটি উত্তম স্থান। আমি আশা করি বৃক্ষমেলা হতে জনগণ তাদের চাহিদা মত চারা সংগ্রহ করে বৃক্ষরোপণ অভিযানে অংশ গ্রহন করবেন।

বৃক্ষরোপণ অভিযানকে গতিশীল, আরও প্রতিযোগিতামূলক ও সবুজ বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে। যে সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার, ১৯৯৮ পাচ্ছেন আমি তাদের শুভেচ্ছা জানাই। আমি আশা করি বৃক্ষরোপণে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করবে।

আমি জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ১৯৯৯ এবং বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার, ১৯৯৮ এর সাফল্য কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ
সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

বৃক্ষ জীবন ও পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জীবনের জন্য বৃক্ষ, খাদ্যের জন্য বৃক্ষ, পানির জন্য বৃক্ষ, পরিবেশ ও প্রতিবেশের জন্য বৃক্ষ, নির্মাণের জন্য বৃক্ষ, কৃষির জন্য বৃক্ষ, খরা, বন্যা, ঝড় ও জলোচ্ছাস প্রতিরোধে বৃক্ষ, দারিদ্র বিমোচনে বৃক্ষ, অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৃক্ষ। এ কথা অনুধাবন করে আমাদের বৃক্ষ এবং বৃক্ষ সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে আরো বেশী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান সভ্যতায় আধুনিক ও রুচিশীল সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিতে বৃক্ষের ব্যবহার সর্বাধিক। ১৫ই জুন হতে তিন মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু হচ্ছে। বন অধিদপ্তর এ বছরের বৃক্ষরোপণ অভিযানে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমকে সফল করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক বৃক্ষের চারা উৎপাদন সহ আনুষঙ্গিক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বনজ সম্পদের চাহিদাও বেড়েছে। সে জন্য যুগের সাথে সমতা রেখে বৃক্ষ সম্পদ বৃদ্ধিতে বন অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

বন্য পশুপাখী আমাদের অতি আপন ও উপকারী জন্তু। দেশের বনাঞ্চল ও গাছগাছালি কমে যাওয়ায় বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের ও খাদ্যসামগ্রীর ঘাটতি দেখা দিয়েছে। তাই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির নিমিত্তে ব্যক্তি ও সরকারী পর্যায়ে বন্যপ্রাণীর উপযোগী বৃক্ষ ও গাছগাছালি রোপণে জনগণের প্রয়োজন ও সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

বন্যপ্রাণীর প্রতি সহমর্মিতা বৃদ্ধি ও সদয় হওয়ার দায়িত্ব আমাদের সকলের। মনুষ্য সমাজের কর্মকাণ্ডের উপরই নির্ভর করে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের ভবিষ্যত। আমাদের সকলকেই এ বিষয়ে উপলব্ধি করতে হবে। একদা বন্যপ্রাণীর সমৃদ্ধ এই বাংলায় বন্যপ্রাণীর আজ অতি অল্পই অবশিষ্ট রয়েছে। সময় বয়ে যাচ্ছে। তবে তবুও সচেতন হবার সময় এখনও সবটুকু ফুরিয়ে যায়নি।

পুরোনো গাছে ঢাকা, ছায়ায় ঢাকা, বন্য পাখীর কলকাকলি মুখরিত বাংলার পরিবেশের আমেজ সৃষ্টির লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর ফরেষ্ট্রি সেক্টর প্রকল্প, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্পের মত বিভিন্ন সামাজিক বনায়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত করছে। বন অধিদপ্তরের যুগোপযোগী বাস্তব পদক্ষেপ, গ্রাম পর্যায়ে সামাজিক বনায়ন প্রশিক্ষণ ও বহুমুখী প্রচারের ফলে আজ গ্রামে গঞ্জে বৃক্ষ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনগণ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় বনায়ন করে আর্থসামাজিক ও পরিবেশ উন্নয়নে অবদান রাখছে। গ্রামীণ জনপদে অনেক বৃক্ষ নার্সারী স্থাপিত হয়েছে এবং প্রতি বছর সে সব নার্সারী হতে কোটি কোটি চারা উৎপন্ন ও বিক্রয় হচ্ছে। আজ হাটে বাজারে বৃক্ষ চারা পণ্য হিসেবে ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে এবং তা অন্যান্য পণ্যের মত চারা বিক্রয়ের জন্যও বাজারে একটি জায়গা নির্দিষ্ট হচ্ছে। এ সব সাফল্য বন অধিদপ্তরের নিরলস প্রচেষ্টার ফল।

বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার, ১৯৯৮ যারা পাচ্ছেন তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই। আমি আশা করি আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস জনগণকে বৃক্ষরোপণে আরও বেশি উৎসাহিত করবে।

পরিশেষে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ১৯৯৯ এবং বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার, ১৯৯৮ স্বার্থক ও সফল হউক এই কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

মোঃ গোলাম হাবিব
প্রধান বন সংরক্ষক
বাংলাদেশ

সোনালী ব্যাংক
জনতা ব্যাংক
অগ্রণী ব্যাংক
Biman BANGLADESH AIRLINES your home in the air